রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদা' ও বাউলদর্শন

মাহফুজা হিলালী*

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) অনেক লেখায় বাউলদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কয়েকটি নাটকের ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতনের সন্ধান করেছিলেন। ঠাকুরদার জীবনবোধ তাঁর অরূপরতন প্রাপ্তির পথ। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা একজন নয়– অনেকজন। এরা প্রত্যেকেই আলাদা। কিন্তু একটি জায়গায় এক, তা হলো সকলেই সংসারবিবাগী এবং বিশ্বসংসারের অপরিহার্য অংশ। এরা সংসার বিবাগী হয়ে সংসারের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যদিও বাউলদের পথ এবং রবীন্দ্রনাথের পথ এক নয়, কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক। বাউলরা যে মনের মানুষের সন্ধান করেন, ঠাকুরদা সেই মনের মানুষের সেবা করেন। ঠাকুরদা বৈরাগী এবং তাঁর ভেতরে মানবধর্ম ও ইহজাগতিকতা স্পষ্ট। তবে ঠাকুরদার জীবনাচরণে বাউলদের দেহতত্ত্ব পাওয়া যায় না। তাই বাউলদর্শনের সাথে ঠাকুরদা চরিত্রের কিছু অমিল রয়েছে। এ প্রবন্ধে বাউলতত্ত্বের সাথে ঠাকুরদার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও দেখানো হয়েছে বাউলতত্ত্ব কী, লালনের কোন প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রকট। বাউলতত্ত্বের সাথে রবীন্দ্রনাথের বাউলমনের মিল এবং অমিল কোথায়। রবীন্দ্রনাথ কতো রকমের বাউলের কথা বলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ কেন ঠাকুরদা চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন; এই চরিত্রটি কেন বাউলচরিত্র হয়ে উঠলো; সমাজব্যাবস্থায় ঠাকুরদা কী প্রভাব ফেললেন ইত্যাদি। সর্বোপরি, বাউলদর্শন মানবজীবনে কী প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তা-ও দেখানো হয়েছে প্রবন্ধে।

চাবি শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, বাউলদর্শন, ঠাকুরদা, মানবধর্ম।

একুশ বছর বয়সে 'সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন' অনুভবের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর প্রাণের সাধনা শুরু হয়েছিলো এবং সমস্ত জীবন ধরে চলেছিল তার প্রবাহ। তাঁর প্রাণের সাধনা আনন্দের সাধনা। মনের চাওয়া-পাওয়াই এখানে মূল কথা। মনের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক ছড়া, কবিতা, গান লিখেছিলেন। আবার চরিত্রও চিত্রায়ণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে ঠাকুরদা প্রধান। ঠাকুরদা কখনো কখনো দাদাঠাকুর নামেও প্রকাশিত হয়েছে। ঠাকুরদার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– তাঁর বৈষয়িক বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই, আপন মনে আনন্দের সন্ধান করেন তিনি। অর্থাৎ, আচারধর্মের প্রতি এঁদের কোনো আকর্ষণ নেই, হৃদয়ধর্মে এঁদের পথ চলা। তাই এঁরা জাত-পাতের ধার ধারেন না–মানুষই মুখ্য। এদের ঘরের উল্লেখ নেই, পথের উল্লেখ আছে। এরা মানুষের কল্যাণকামী। ঠাকুরদা চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাউলদের বৈশিষ্ট্য। তবে বাউলদের সব বৈশিষ্ট্যই ঠাকুরদাদের মধ্যে নেই। আবার ঠাকুরদাদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা বাউল দর্শনে নেই। তাই ঠাকুরদা চরিত্র গবেষণার দাবি রাখে।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্ন হলো ঠাকুরদাকে কি বাউল বলা যায়? কোন অর্থে তিনি বাউল। রবীন্দ্রনাথ কি নতুন বাউল-সত্তার সন্ধান করেছেন? ঠাকুরদা কি রবি বাউল? ঠাকুরদা-সত্তার মধ্য দিয়ে রবি বাউলের স্বরূপ কতোটা উন্মোচিত হয়েছে; বাউল দর্শন বা লালনের দর্শনের সাথে রবি বাউলের পার্থক্য কোথায়। কিংবা রবীন্দ্রনাথ কি বাউল-দর্শনকে সংস্কার করে ভিন্ন এক বাউল দর্শনের কথা বলেছিলেন? বক্ষ্যমাণ গবেষণায় এসব প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপরতনের সন্ধান করেছিলেন। ঠাকুরদার জীবনবোধ তাঁর অরূপরতন প্রাপ্তির পথ। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা একজন নয়–অনেকজন। *শারদোৎসব*, *রাজা*, *ডাকঘর*, *অচলায়তন*, *গুরু*, *অরূপরতন* প্রভৃতি নাটকে সাতজন ঠাকুরদাকে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি জায়গায় এক, তা হলো এঁরা সকলেই সংসারবিবাগী এবং মানবপ্রেমী। এদের বেশিরভাগেরই সংসারের কোনো পরিচয় নেই। কখন কোথা থেকে আসেন তাও বলা নেই। কিন্তু তাঁরা বিশ্বসংসারের অপরিহার্য অংশ। তাঁরা সংসার বিবাগী হয়ে সংসারের দায় কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এ বৈশিষ্ট্যও বাউলদের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া *প্রায়শ্চিত্ত*, *মুক্তধারা* নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং *বসন্ত* নাটকে 'কবি'কে পাওয়া যায়। এঁরাও বাউলদর্শনে বিশ্বাসী। আবার সন্ন্যাসী (রাজা বিক্রমাদিত্য), উপনন্দ, সুরঙ্গমা, পঞ্চকরাও এক ধরনের বাউল চরিত্র। এঁরা সকলেই প্রাণের সাধনা করেন। এঁদের কেউ মনের মানুষকে পেয়েছেন, কেউ খুঁজছেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল কবিতায় লিখেছিলেন:

আর কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ।[১]

এ লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় ঘরের দরকার নেই। আকাশ আর মাঠ হলেই বাউলদের চলে। রবীন্দ্রনাথেরও তাই। *ছিন্নপত্রাবলী*-র ১৫৪ সংখ্যক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'সন্ন্যাসীরা যে রকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম।'[২] এতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে একজন বাউল বাস করতেন। পূর্ববঙ্গে এসে তিনি বাউলদের গান বেশি করে শুনেছিলেন এবং বাউলদর্শন অনুভব করেছিলেন।

বাংলাদেশে বহু লোকসংস্কৃতি বা লোকদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো বাউল দর্শন। বাউলরা কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম মানেন না। তারা মনে করেন মানুষের ভেতরেই ঈশ্বর বাস করেন। ঈশ্বরকে এঁরা বলেন মনের মানুষ। মনের মানুষকে পাওয়ার জন্যই এঁদের সাধনা। আশুতোষ ভট্টাচার্য বাউলদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট একটি প্রণালীর নামই বাউল, যাহারা এই প্রণালীর সাধক তাহাদিগকে বাউল বলে। ইহা একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিশিষ্ট প্রণালীর সাধকদিগের নিকটই এই অনুভূতির উপলব্ধি হয়–ইহা ভগবানের সঙ্গে মানবের একটি অবিচ্ছেদ্য ও সুনিবিড় সম্পর্ক বোধের অনুভূতি; ভগবানই স্বামী (সাঁই) বা একমাত্র প্রভু; তাহার সঙ্গে বাউল অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যস্থতা ব্যতীতই সুনিবিড় মিলনের আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।'[৩] তবে, 'বাউল গানে ধর্মের চেয়ে জীবন প্রাধান্য পেয়েছে।'[৪] তাছাড়া, 'বাউলদের কোনো ধর্মগ্রন্থ অথবা শাস্ত্র নেই।

আনুষ্ঠানিক ধর্মও নেই। কিন্তু তাঁরা ভক্তিবাদী এবং একজন গুরুতে বিশ্বাসী।'[৫] বাউলদের ধর্মগ্রন্থ এবং আনুষ্ঠানিক ধর্ম না থাকলেও বাউলরা পরিষ্কার দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। গোলাম মুরশিদ লিখেছেন:

> এক দলের ধর্ম ইসলামী ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে মিশেছে সুফীবাদী দর্শন ও দেহতত্ত্বের রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন। বাউলদের অন্য দলের ধর্মের ভিত্তি বৈষ্ণবধর্ম, প্রধানত নিম্নবর্ণের বৈষ্ণবধর্ম। চৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা অগ্রাহ্য করে তাঁর শিষ্যদের সামাজিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে সমাজের নীচের তলার বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দীক্ষা নিয়েছিলো বৈষ্ণবধর্মে। কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর তাঁর ছয় গোস্বামীর নেতৃত্বে বৈষ্ণব ধর্মে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। গোস্বামীরা সংস্কৃতায়নের পথ ধরে প্রায় নিঃশব্দে বৈষ্ণবধর্মে পুরোনো জাতিভেদের দেয়ালগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবরা তখন বোষ্টম-বোষ্টমী নামের আড়ালে মূলধারা বৈষ্ণবধর্ম থেকে ধীরে ধীরে সরে গেলো। ... কেউ কেউ বাউলদের দলে ভিড়লো। এই বিশেষ শ্রেণীর বাউলরা রাধাকৃষ্ণের ভজনা করে, সেই সঙ্গে দেহতত্ত্বের নামে যৌনতার সাধনা করে। সুতরাং মোটা কথায় বললে একদল বাউল হলো দলছুট 'মুসলমান', যারা নিজেদের বলে 'ফকির'। আর-এক শ্রেণীর বাউল আসলে দলছুট 'বৈষ্ণব', যারা নিজেদের বাউল বলে চিহ্নিত করে।[৬]

তবে এই দুদলের কেউ-ই আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করে না, মানবধর্মে বিশ্বাস করে।

বাউলদের গুরু হলেন লালন শাহ। 'লালন ফকির নিজেকে 'ফকির' বলে আখ্যায়িত করেছেন তাঁর গানে। তাঁর সাধনা গুপ্ত এবং দেহভিত্তিক হলেও মনের মানুষের অন্বেষণ ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। তাঁর গানে আল্লাহ, নবী, বেহেস্ত, দোজখ গুরুত্ব পেলেও তিনি কোনো মূলধর্মের অনুসারী ছিলেন না। তাঁর সাধনা গুরুবাদী এবং কেবল দীক্ষিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।'[৭] মানুষ ভজনই বাউল দর্শনের মূল কথা; লালনেরও। লালন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন আত্মাকে। তাঁর মতে, আত্মাকে জানলেই সৃষ্টিকর্তাকে জানা যায়। 'মানুষের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা' এটাই লালন দর্শনের অন্যতম প্রধান মতবাদ। তাই ধর্ম তাঁর কাছে গৌণ–মানুষই সমস্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভেতরে একজন বাউলসত্তা বাস করতো। এ কারণে রাঙা মাটির পথ বার বার তাঁর মন ভুলিয়েছে। এ কারণেই তাঁর গানের ওপারে প্রেমপ্রতিমা দাঁড়িয়ে থেকেছে এবং এ কারণেই তিনি বলতে পেরেছেন, 'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে আমি ডুবতে রাজি আছি।' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে বাউলসত্তা প্রকট, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আশুতোষ ভট্টাচার্যের আরেকটি মন্তব্যে। তিনি লিখেছিলেন, 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাউলদর্শনকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। যখন তিনি নিখিল ভারত মহাসম্মেলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অভিভাষণে বাউলসংগীত উদ্ধৃত করিয়া তাহার দার্শনিক মূল্যের যে ভাব বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহাদের ষড়দর্শনের মধ্যে আর কোনো দর্শনকে সেইভাবে বিচার করিয়া দেখেন নাই। তাঁহার সেই অভিভাষণের অভিনবত্ব সেদিন সকলকেই অভিভূত করিয়াছিল।'[৮] আগেই উল্লেখ করা হয়ছে যে, শুধু গান-কবিতা নয়, নাটকের চরিত্রেতেও তিনি বিভিন্ন বাউলসত্তা চিত্রায়ণ করেছিলেন। এমনকি *গোরা* উপন্যাসে আছে– রাস্তায় বাউল গান গাইছে। নাটকে তিনি বাউলসত্তা এনেছেন মনের পরিপূর্ণ

আবেগ মন্থন করে। এবং তা এক রকম করে নয়, বিভিন্নভাবে। এই বিভিন্ন রকমের মধ্যে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর চরিত্রটি বাউলসত্তায় অঙ্কিত। তবে ঠাকুরদা বাউল-বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ধারণ করেন না।

শারদোৎসব নাটকে একজন ঠাকুরদা আছেন। তিনি শরতের ছুটিতে বালক দলকে নিয়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। বেতসিনীর তীরে বনের ভেতরে তাদের শরতের উৎসব হয়। ঠাকুরদা বালকদের বলেছেন, 'না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; ... আমি সকল দলের মাঝখানে থাকবো, কাউকে বাদ দিতে পারবো না।'[৯] এখানে ভেদাভেদ বা দলাদলি দূর করার কথা বলা হয়েছে। *অচলায়তন*-এর দাদাঠাকুর সম্পর্কে প্রথম শোণপাংশু বলেছে, 'আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি সব দলের শতদল পদ্ম।'[১০] এখানে বাউলদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ফুটে উঠেছে। লালনের 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে, লালন বলে জাতের কী রূপ দেখলাম না এ নজরে।'– এর সাথে এই অংশের তুলনা করা চলে। শোণপাংশুরা গানের মধ্যে দাদাঠাকুরকে 'মনের মানুষ' বলেছে। বাউলরা যে মনের মানুষের সন্ধান করেন দাদাঠাকুরকে সেই মনের মানুষ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাউলরা মনে করেন মানুষের মনের মধ্যেই মনের মানুষের বাস। এই মনের মানুষ গুরু বা ঈশ্বর। দাদাঠাকুর তাই ঈশ্বরকে অবমাননা করতে পারেন না। অর্থাৎ কোনো মানুষকে তিনি অবমাননা করেন না। আবার 'গুরুও পরম্পরা।'[১১] তাই লালন যেমন বাউল বা ফকির, তিনি তেমনি গুরুও। আবার লালনের গুরু সিরাজ সাঁই। তিনিও বাউল বা ফকির ছিলেন। সুতরাং তাঁরা একদিকে মানুষ, অন্যদিকে তাঁদের মধ্যেই মনের মানুষের বাস। এটাই বিশ্বাস করেন বাউলরা। তাই দাদাঠাকুর একদিকে যেমন বাউল, অন্যদিকে শোণপাংশুদের মনের মানুষ। তবে রবীন্দ্রনাথ দাদাঠাকুরকে আরও অনেকগুলো বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন, সেগুলো হলো– 'একলা মোদের হাজার মানুষ', 'মজার মানুষ', নানা কাজে, নানা সাজে 'খেলার মানুষ', 'সব মিলনে মেলার মানুষ', হাসির দলে, চোখের জলে 'সকল ক্ষণের মানুষ', ঘরে ঘরে বাহির করে 'আমাদের কোণের মানুষ'।–এর পরই বলা হয়েছে 'আমাদের মনের মানুষ'। এই বিশেষণগুলো রবীন্দ্র-মানসেরও প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথ সত্য শিব সুন্দরের কবি। তিনি বলেছিলেন, 'জগতের আনন্দলোকে আমার নিমন্ত্রণ।' অর্থাৎ জগতের নিমন্ত্রণেই তিনি জগতে পদার্পণ করেছেন। হেসেখেলে জীবন পার করতেই তিনি আগ্রহী। এখানেই তাঁর বাউল মন–বাউলসত্তা; এখানেই তিনি রবি বাউল। তাই বলা যায়, 'চরিত্রটি (দাদাঠাকুর) রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের বেশ খানিকটা ধারণ করে।'[১২] রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবযাপনকে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন দাদাঠাকুর চরিত্রের চিত্রায়ণ সেভাবেই করেছেন। যেন ঠাকুরদা একবার পঞ্চককে বলে, 'যেদিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠবে সেইদিন আমি হুকুম করব।'[১৩] এখানে বোঝা যায় হৃদয়ের ডাককেই রবীন্দ্রনাথ প্রধান বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আরোপিত কোনো হুকুম বা আদেশ চাপিয়ে দিতে চাননি। সে হুকুম যদি বাউল মনের হুকুম হয়, তাও নয়। অর্থাৎ 'প্রাণের সাধনা'ই মূল কথা। দাদাঠাকুর জাতপাতের ধার ধারেন না। তাই শোণপাংশু আর দর্ভকদের ছোঁয়া খাদ্য খান তিনি। এরাই তার খেলার সাথি, গান গাওয়ার সাথি। যারা জগৎ-সংসারকে জটিল-কঠিন করে তোলে, তাদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হলে দাদাঠাকুর নিজে যান পাপমোচন করতে। সেখানে তার রুদ্রমূর্তি। তখন আর তিনি দেরি করেন না, অনুসারীদের আদেশ দেন। সমস্ত অনাচারকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে জগতে আনন্দ প্রবাহিত করাই তখন তার কাজ

হয়ে ওঠে। অচলায়তনে নিয়মের অনাচারে যখন শিশু-বৃদ্ধ সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তখন তিনি আয়তনের প্রাচীর আকাশের সাথে মিলিয়ে দিয়ে আনন্দের ধারা বইয়ে দেন। আচার্যকে তিনি বলেছেন,

> ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই–আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে–তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে তারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক–আজ দুর্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক-না–আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।[১৪]

উন্মুক্ত স্থানে সকলের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন দাদাঠাকুর। দাদাঠাকুরের বাড়ি কোথায় তা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। পথেই সকলের সাথে তার দেখা হয়। কিন্তু তিনি গুরু। রবীন্দ্রনাথ গুরুর সাথে সকলের মিলন ঘটিয়েছেন। বাউলদর্শনে গুরুই ঈশ্বর। 'বাউলরা গুরুবাদী। গুরুকে এরা ঈশ্বর বা আল্লাহর অবতার বলে জানে।'[১৫] দাদাঠাকুরের সাথে আচার্যকে মিলিয়ে দিতে চান পঞ্চক। ঠাকুরদার সাথে মিলেছেন পঞ্চক, আচার্য, উপাধ্যায়সহ অচলায়তনের অনেকেই। কিন্তু মহাপঞ্চক মিলতে পারেনি। কারণ সে আচারধর্ম পালন করে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যারা আচারধর্ম পালন করে, তারা প্রাণের ধর্মে মিলতে পারে না। বাউল দর্শনের সাথে এখানে তার মিল। *শারদোৎসবের* ঠাকুরদা বালকদের সাথে নিয়ে গেয়ে ওঠেন, 'আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি/ কাটবে সকল বেলা।'[১৬] বিনা কাজে বাঁশি বাজানো হৃদয়ধর্মের আরাধনা করা। রবীন্দ্রনাথের নিজের 'আসমানদারি'র মতো। ঠাকুরদা সন্ন্যাসীর মনের ভাব বুঝে তাই বলতে পারেন, 'বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্র পাড়ি দেবেন!'[১৭] এর অর্থ আত্মার তৃপ্তিতে জীবন চলা। বাউলরা মনের মানুষকে খুঁজে চলেন প্রতিনিয়ত আর রবি বাউল খোঁজেন আত্মার সুখ। ঠাকুরদা তাই গানে গানে বলেন দুখের তরী পাড়ি দিতে গান গেয়ে পালের রশি কষে ধরেন। দুখের তরী পাড়ি দিয়েই মনের মানুষকে পেতে হয়। *রাজা* নাটকে সুদর্শনার রাজাকে সন্ধান করা মনের মানুষকে সন্ধান করা। মনের মানুষের সন্ধানে সুদর্শনা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'ইহার (*রাজা* নাটক) মধ্যেই বাংলার বাউলসাধনার ভাবটির পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল বিচ্ছিন্ন সংগীত ও সংলাপের মধ্য দিয়া নহে, একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়া নহে, একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়া আনুপূর্বিক এই ভাবটিকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এমন কি, বাউলের ভাষাতেই ইহাতে রবীন্দ্রনাথ বাউলের সংগীত রচনা করিয়াছেন।'[১৮] সুদর্শনা এবং রাজা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য আরও লিখেছিলেন,

> বাংলার বাউল সাধনায় এই কথাই বলা হইয়াছে যে আমার প্রভু আমার মনের ভিতর থাকিয়া আমার নিভৃত অবসরে আমার সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু তাহাকে আমরা চোখে দেখিতে পারি না। বাউলসাধকগণ তাহাকে অধর বা অধরা অর্থাৎ যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে, এ কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের 'রাজা' চরিত্রও তাহাই। সুদর্শনার মনের ভিতর থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে তিনি কথা বলেন, কিন্তু সুদর্শনা যখন তাহাকে বাহিরে বিশেষ কোনো রূপের

> ভিতরে দেখিতে চাহেন, তখন তিনি তাহা পারেন না। ... সুদর্শনার মনের মধ্যেই তাহার মনের মানুষ ছিল, কিন্তু সুদর্শনা তাহাকে মনের মধ্যে তাহার সন্ধান না করিয়া তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিতে গিয়াছিলেন।[১৯]

এ তো গেলো সুদর্শনার কথা। এ নাটকে ঠাকুরদাও উপস্থিত। *রাজা* নাটকে ঠাকুরদা মনের মানুষের সন্ধান পেয়ে গেছেন আগেই। তাই তাকে আমরা গুরু হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। তিনি সাধারণ লোকদের বলেন যে, 'আমাদের রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে– তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে!'[২০] বাউলদর্শন এ কথাই বলে যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। সুতরাং সকলকে রাজা করে দেওয়া মানে সকলের মনের ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ঠাকুরদা গান গেয়ে ওঠেন– 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,'[২১]–এই রাজ্যের রাজাকে দেখা যায় না, কিন্তু রাজ্য চলে নির্বিঘ্নে। এটা কী করে সম্ভব! সম্ভব হয় এ জন্য যে, রাজ্যের সবাই রাজা।

এরপর ঠাকুরদা বিভিন্নভাবে রাজার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। আবার একজন রাজা সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনে তিনি কুম্ভকে বলেন, 'আমাদের রাজা যদি-বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না– সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।'[২২] এভাবে ঠাকুরদা নানাভাবে সবার সামনে মনের মানুষের কথা বলেছেন। কিন্তু এই গূঢ় তত্ত্ব সাধারণের বোঝার অসাধ্য। কেউ তার সন্তান মারা গেছে বলে 'রাজা নেই' বলছেন, অন্যদিকে ঠাকুরদার পাঁচ ছেলে মারা যাওয়ার পরও 'রাজা আছেন' বলছেন। এই 'রাজা' তার মনের মধ্যে স্থাপিত। *রাজা* নাটকে সরাসরি বাউলেরও উপস্থিতি রয়েছে। তারা গান গেয়ে রাজার পরিচয় দিয়েছেন:

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।[২৩]

অর্থাৎ মনের মধ্যে যে ঈশ্বর রয়েছেন, তাকে বাইরে খুঁজতে যাওয়া যায় না। অন্তরের গহনে ডুব দিতে হয়। তাঁকে পেলেই মুক্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন আত্মার মুক্তি।

রাজা নাটকের 'রাজা' বাউলের মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, গুরু বা ঈশ্বর-এর সমরূপ। ঠাকুরদা নিজেকে তাঁর বন্ধুও বলেছেন। রাজার পুরস্কার দেওয়া সম্পর্কে বলেছেন, 'বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয়।'[২৪] এতে বোঝা যায় পুরস্কারের আশায় তিনি রাজার কাজ করেন না; ভালোবেসে করেন।

ঠাকুরদা রাজা সম্পর্কে গানে গানে বলেছেন:

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়।।[২৫]

এ গানের বিশ্লেষণ মানব জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি দেখেন কিন্তু দেখা দেন না অথচ, আড়াল থেকে ভালোবাসেন, তিনিই তো বাউলের মনের মানুষ আর সাধারণের ঈশ্বর। তাঁরই ভালোবাসায় ঠাকুরদার মন মজে আছে।

শুধু সাধারণের কাছেই নয়, রানি সুদর্শনার কাছেও রাজাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ঠাকুরদা; বলেছেন, 'সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি– এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।'[২৬] আবার সুদর্শনাকে চিনতে দেওয়া সম্পর্কে বলেছেন, 'দেবে বৈকি– নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন। ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে। সে তো সহজ লোক নয়।'[২৭] কাঞ্চী রাজাকে জানিয়েছেন যে, পথে বের করাই রাজার স্বভাব। কাঞ্চীরাজকেও রাজা পথে বের করেছেন। আবার রানি সুদর্শনাও পথে বেরিয়ে বেঁচে ওঠেন। এরা সকলেই বাউল সাধক। মনের মানুষের খোঁজে এদের পথে বের হওয়া। তাই সুদর্শনার মন বদলে গেছে। বাহ্যিক সমারোহের পরিবর্তে তিনি হৃদয়ের স্নিগ্ধতার কাছে ফিরেছেন। তাই ঠাকুরদা যখন বলেছেন রাজার কোনো বাহ্য-সমারোহ নেই, তখন সুদর্শনা বলেছেন, 'বল কী, সমারোহ নেই? ঐ-যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।'[২৮] আর ঠাকুরদা গুরু হিসেবে শিষ্য সুদর্শনা আর কাঞ্চীর উদ্দেশে বলেছেন, 'এখন আমাদের বসন্ত উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক– ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করেছ? যে পায়, তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে! সে ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।'[২৯]

রাজার ঠাকুরদা গৃহী। নাটকে ঠাকরুনদিদির কথা এসেছে। আবার তার পাঁচ ছেলে মারা যাওয়ার কথাও উল্লেখ আছে। গৃহী হওয়ায় ঠাকুরদার বাউল-আচরণের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কারণ বাউল সম্প্রদায় দু রকমঃ পথের বাউল বা বৈরাগী বাউল আর গৃহী বাউল। বৈরাগী বাউলরা ভিক্ষাজীবী আর গৃহী বাউলরা সাধারণ গৃহকর্মের মাধ্যমে জীবনধারণ করে এবং গৃহে থেকেই সাধন-ভজন করে। *রাজা* নাটকের ঠাকুরদা দ্বিতীয় ধরনের। কিন্তু *শারদাৎসব*এর দাদাঠাকুর পথের বাউল। *অচলায়তন*-এর ঠাকুরদারও ঘরের উল্লেখ নেই।

ডাকঘর-এর ঠাকুরদা সম্পর্কে প্রথমেই বলা হয়েছে 'ছেলে খেপাবার সদ্দার'। এবং 'ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই' তার বুড়ো বয়সের খেলা। নিজের সম্পর্কে মাধব দত্তের কাছে এই বিশেষণগুলো শুনে, তিনি আর মাধব দত্তের পোষ্যপুত্র অমলের সাথে দেখা করতে যান না। বরং নিজের কাজকর্ম সেরে পরে এসে ভাব করতে চান। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার অন্য মতলব থাকে। অমলকে ঘরে আটকে রাখতে তিনি ফকির সেজে অমলের সাথে ভাব করেন। অমলকে যতো রাজ্যের গল্প বলে একটু আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে বলেছেন, 'তুমি যে কী নও তা তো ভেবে

পাই নে।'[৩০] একটি মৃত্যুপথযাত্রী বালককে মানসিক শান্তি দেন ঠাকুরদা। মৃত্যু অবধারিত জেনে অমলকে স্বপ্ন রাজ্যে পৌঁছে দেন তিনি। অন্তত অসুস্থতার কষ্ট যেন তার লাঘব হয়। এখানে মানবধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, *গুরু* নাটক *শারদোৎসব* এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যুনক এবং দর্ভকদল গুরুকে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে গান গেয়ে–

প্রভাতসূর্য, এসেছে রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারই হউক জয়।[৩১]

আবার, *মুক্তধারা* নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রবেশ করেন গান গাইতে গাইতে–

আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।[৩২]

প্রায়শ্চিত্ত-এর ধনঞ্জয়ের সাথে এই ধনঞ্জয়ের প্রায় পুরোটাই মিল। এখানেও তিনি রাজার সাথে সত্য বলতে ভয় পান না। কারণ তিনি মনের মানুষকে পেয়েছেন। তাই রাজাকে অবলীলায় বলেন, 'আমার উদবৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।'[৩৩] যদিও তিনি পথের মানুষ, তাকে খাজনা দিতে হয় না তবু দরিদ্র মানুষগুলোকে তিনি বাঁচাতে চান। তাই রাজার কাছে গিয়ে তিনি নিজে কথা বলেন। আবার অনন্তযাত্রাকে মুক্তি বলে নির্দেশ করেন। যুবরাজ মানুষের জন্য আত্মাহুতি দিলে তিনি মনে করেন যুবরাজের মুক্তি ঘটেছে।

বসন্ত নাটকের কবিও ঠাকুরদার অন্য সংস্করণ। তার মধ্যেও এক ধরনের বাউলসত্তা রয়েছে। তাই তিনি অর্থসচিবকে দিয়ে পর্যন্ত নাচ করিয়ে নেন। বলেন, 'ওঁর-যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারী থাকলে গৌরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।'[৩৪] বৈষয়িক বিষয়গুলো বাদ দিলে হৃদয়বৃত্তিগুলো বেরিয়ে আসে। বাউলরা সব সময়ই বিষয়সম্পত্তির প্রতি উদাসীন হন। বৈরাগ্যেই তাঁদের সাধনা। বোঝা যাচ্ছে, কবিও বাউলদের দলে। তিনি তাই অগৌরবের উৎসব দেখে খুশি হয়ে ওঠেন। এবং সগৌরবে ঘোষণা করেন, রাজগৌরব টিকলো না– 'তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।'[৩৫]

শারদোৎসব-এর সন্ন্যাসী (রাজা বিজয়াদিত্য) বাউলদর্শনের ধ্বজাধারী। তাই প্রাণের সাধনায় রাজকাজ ফেলে সন্ন্যাসী সেজে তিনি শরতের উৎসব দেখতে বের হন। বালকদের চেলা সাজতে তার ইচ্ছে করে। বালকদের গান শুনতে তার ভালো লাগে। তার দর্শন হলো যে কাজে মানুষ আনন্দ পায়, সেই কাজের মধ্যেই তার উৎসব। তাই উপনন্দ গুরুর ঋণ শোধের জন্য উৎসবের আনন্দ

ছেড়ে পুঁথি নকল করছে দেখে তিনি বলেন, 'আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে– ... তুমি পঙক্তির পর পঙক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ। ... দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।'[৩৬] ঠাকুরদাদা এবং বালকরাও সেই পুঁথি নকল করতে বসে যান। এখানে গোষ্ঠীবদ্ধতার ইঙ্গিত আছে। বাউলরা এককভাবে থাকেন না। এঁরা একটি সম্প্রদায়। তাই ঠাকুরদাকেও দেখতে পাই বালকের দল নিয়ে ঘুরতে। আর পুরো দলকে উপনন্দের কাজে বসিয়ে দেন সন্ন্যাসী। তবে তিনি কাউকেই পুঁথি লেখার কাজে হাত দিতে বলেননি। বরং নিজে লিখতে বসেছেন। আর তাই দেখে ঠাকুরদা এবং বালকগণ লিখতে বসে যান। এখানে সন্ন্যাসীর মধ্যে বাউলদের সাধনা স্পষ্ট। বাউলরা কখনো কাউকে নিজের দলে ভেড়ানোর জন্য জোর করেন না। তাঁরা তাঁদের সাধনা করে চলেন। যার যা শিখবার বা অনুসরণ করবার, তা করে নেন।

উপনন্দের আনন্দও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দর্শন। উপনন্দের একটি দীর্ঘ সংলাপ বাউল-ভাবনার স্বরূপ উন্মোচন করেছে। সংলাপটি হলো–

> মনে করেছিলেম, লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল–অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে, আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু-একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে–মনে হবে, আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।[৩৭]

এখানে উপনন্দ মনের ডাকে কাজ করেন। তাকে কেউ বাধ্য করেনি। কিন্তু মনে মনে তিনি গুরুর ঋণ স্বীকার করতে চান। তাই তার এই সাধনা। এটা হলো উপনন্দের আত্মার মুক্তি।

পঞ্চক-এর মধ্যেও বাউল-সত্তা দেখা যায়। তিনিও প্রাণের সাধনার পক্ষে। তাই সুভদ্র তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের বন্ধ জানলা খুলে আয়তনের সবার কাছে অপরাধ করলে পঞ্চক তাকে আলিঙ্গন করেন। সুভদ্র ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আতঙ্কিতভাবে যখন উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছে, 'আমার কী হবে।' তখন পঞ্চক বলেছেন, 'তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ।'[৩৮] রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত আদর্শে পুষ্ট এ চরিত্র অস্পৃশ্য জাতির সঙ্গে মেশে, তাদের সঙ্গে নাচ-গান করে, এমনকি বনভোজন করতেও পিছপা হয় না।[৩৯] কঠোর নিয়মের অচলায়তনে আবদ্ধ থেকে সে নিচু জাতের সাথে বন্ধুত্ব করে। এটা তার চরিত্রে বাউল বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক। তিনি অচলায়তনের আচার্যের সাথে দাদাঠাকুরকে মিলিয়ে দিতে চান। তার কাছে মনে হয় দাদাঠাকুরকে অচলায়তনে নিয়ে গেলে অচলায়তনের সব দুঃখ দূর হবে। অবশ্য আয়তনের সদস্যরা একে দুঃখ বলে মনে করে না। কিন্তু পঞ্চক জানেন এটা মানবতার জন্য দুঃখ। তাই তিনি এই দুঃখ মোচন করতে চান। দাদাঠাকুর এবং পঞ্চকের কথোপকথনে গুরু-শিষ্যের আভাস পাওয়া যায়।

পঞ্চক বলেছেন দাদাঠাকুর তাকে অস্থির করে তুলেছে। আবার দাদাঠাকুর বলেছেন তিনি নিজে অস্থির হয়ে আছেন বলেই পঞ্চকের মনে অস্থিরতার ঢেউ লেগেছে। পঞ্চক আয়তনে ফিরে যাবার সময় একবার দাদাঠাকুরকে বলেছেন, 'ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।'[৪০] –এখানে পঞ্চকের মানসিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। সে মানসিকভাবে উদার হয়ে উঠছে, মানবিক হয়ে উঠছে, কিংবা ঈশ্বরের দেখা পেয়েছে, তাই নিজস্ব সমাজে প্রতিনিয়তই কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে। এখানেও বাউলদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ঠাকুরদা নাম না দিয়ে বৈরাগী হিসেবে ধনঞ্জয় নামের একজনকে চিত্রায়ণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনের মানুষের সন্ধান করেছেন। তার প্রতিই ধনঞ্জয়ের সকল ভরসা। তিনি মনে করেন রাজদরবারে রাজার সাথে আরও একজন বসে থাকেন, প্রভু বা মনের মানুষ। তিনি প্রজাদের কথা শোনেন। তিনি একদিন প্রজাদের আর্জি মঞ্জুর করবেন। তিনি আরও বলেন, যখন কোনো কিছু চূড়ান্ত রূপে পৌঁছায়, তখনই শান্তি আসে। ধনঞ্জয় বৈরাগী পথের মানুষ। তার চাল-চুলো নেই, ঘর-দোর নেই। গানই তার সম্বল। রাজা-প্রজা সকলকেই সে বলতে পারে–

ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।[৪১]

ধনঞ্জয় বৈরাগী বাউল। পথেই তার রাজত্ব। আবার রাজার রাজত্বকেও তিনি পথ মনে করেন। রাজাকে এ কথা তিনি শোনাতে ছাড়েন না। তিনি কখন কোথায় যান, তা তিনি জানেন না। পথই তাঁকে নিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুরের মধ্যে বৈরাগী এবং গৃহী দুরকম বাউলই আছেন। বাউলদের এই দুই ভাগ। তাই ঠাকুরদার সাথে বাউলদের এখানে কোনো বিভেদ নেই। বাউলদের সাথে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর বা রবি বাউলের মূল পার্থক্য হলো দেহতত্ত্ব এবং সাধনসঙ্গী। ঠাকুরদার কোনো সাধনসঙ্গী নেই। গোলাম মুরশিদ লিখেছিলেন, 'বাউলগীতি একই সঙ্গে এর সহজ সরল বাণী এবং গভীর দার্শনিক তত্ত্বের জন্যে হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সবচেয়ে দুর্বোধ্য এ সব গানের দেহতত্ত্ব।'[৪২] এই দেহতত্ত্ব ঠাকুরদা চরিত্রে অনুপস্থিত। বরং দেহ সম্পর্কে এক ধরনের শুচিতা রয়েছে। অধ্যাত্ম সাধনা এখানে মূল কথা। আর আত্মিক আনন্দ এর প্রাণ। 'লালন ফকিরের সাধনায় সুফি ও সহজিয়া মতাদর্শ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ সাধনা যুগলধর্মী হওয়ায় নারী-পুরুষ উভয়েই তাঁর সাধনায় দীক্ষিত ছিল। নারী সঙ্গিনীকে সেবাদাসী বলা হয়। ... লালনের অনুসারীদের মধ্যে ইদানীং অনেকেই গৃহী এবং সন্তানাদি নিয়ে সংসার যাপন করে। কিন্তু লালনের মূলনীতি অনুসারে সংসার ও সন্তানাদি পরিহারের উল্লেখ আছে। দীক্ষা নেবার পর সন্তান ধারণ করা যাবে না। তবে নারী-পুরুষ দৈহিক মিলন সাধন-জন অনুসারে অপরিহার্য।'[৪৩] বাউলদের সাথে রবি বাউলের এখানে মূল পার্থক্য। 'আত্মাকে বাউলগানে 'অচিন পাখি' এবং 'মনের মানুষ' 'অধর মানুষ' নামে চিহ্নিত

করা হয়েছে। ... বাউলসাধনা দেহবাদী সাধনা হওয়ায় তা গুপ্ত এবং কেবল দীক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদের গানে মিথুনাত্মক দেহসাধনার কথাকে সাধারণের কাছে শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমে রহস্য সৃষ্টি করে উপস্থাপন করা হয়। দীক্ষিত সাধক ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এর যথার্থ অর্থ এবং গূঢ় তত্ত্ব জানা সম্ভব হয় না।'[৪৪] রবি বাউলের গানে মিথুনাত্মক দেহসাধনার রূপক নেই। বরং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরকে পাওয়ার বাসনা করেছেন এবং আত্মার মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন।

'বাউলগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর অসাম্প্রদায়িকতা এবং সুগভীর জীবনবোধ। বাউলসাধনাকে এর অনুসারীরা মানবধর্ম বলে থাকে। ... বাউলগানে মানুষই মুখ্য। মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অবস্থান। তিনি তার পরম পুরুষ। বাউল তাকে 'মনের মানুষ' নামে আখ্যায়িত করেছে। তাঁর স্বরূপ সন্ধানই বাউলের সাধনা।'[৪৫] ওপরের আলোচনায় ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা গেছে। আমরা জানি, 'ভিক্ষাবৃত্তি এই সম্প্রদায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।'[৪৬] সন্ন্যাসীকে লক্ষেশ্বর যখন ভিক্ষা দিতে চায়, সন্ন্যাসী তা নিতে রাজি হন। এখানে সন্ন্যাসী এবং ঠাকুরদাদের ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। 'বাউলরা তাদের সাধনার প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকে। একটি, বস্তুকেন্দ্রিক, জৈবিক; অপরটি আধ্যাত্মিক। এমনিভাবে মানবদেহকেও তারা দুটি অংশে বিভাজন করেন। প্রথমটি, ইন্দ্রিয় আচারসর্বস্ব বা কামকেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি, ইন্দ্রিয়াতীত কামবর্জিত; আধ্যাত্মিক।'[৪৭] রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পর্যায়ের সাধক—

> ... রবীন্দ্রনাথ সহজজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বিশ্বাসী ছিলেন। বাউলসাধনার সঙ্গে এখানে তাঁহার অনুভূতির কোনো পার্থক্য নাই। ধর্মের মধ্যে কোনো আচার পালনকে সুফিসম্প্রদায় স্বীকার করে না, প্রত্যক্ষ ভাবেই তাহারা ঈশ্বরানুভূতি লাভ করিয়া থাকে, ইহাই বাউলসম্প্রদায়ের ভাবাদর্শ হইয়াছিল। ইহার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার ঐক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই আচারধর্মকে অস্বীকার করিয়া হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই বিষয় লইয়াই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কয়খানি নাটক রচিত হইয়াছে, যেমন 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'অচলায়তন' ইত্যাদি। ... রবীন্দ্র-সাধনার ইহা একটি মূল কথা। বাউল সাধনারও ইহাই মূল কথা।[৪৮]

সুতরাং কিছু মিল আর অমিল মিলেই রবি বাউলের সৃষ্টি ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর। ওপরের বিশ্লেষণে দেখা গেছে সবগুলো ঠাকুরদা এবং দাদাঠাকুর চরিত্র মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন, *রাজা* নাটকে শুধু সুদর্শনা নয়, কাঞ্চির রাজার পর্যন্ত মানসিক উন্নয়ন ঘটিয়েছেন ঠাকুরদা। এছাড়া, সাধারণ মানুষেরা ঠাকুরদার কথায় রাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবতে শিখেছেন এবং নিজেদের আত্মার শুদ্ধতা উপলব্ধি করেছেন। এ রকম উদাহরণ সবগুলো ঠাকুরদা চরিত্রেই রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনে উপনিষদের প্রভাব রয়েছে প্রকটভাবে, তবে বাংলার বাউলের প্রভাবও অনেক। এ কারণেই তাঁর ঠাকুরদা চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে। আলোচনায় দেখা গেছে ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর বা ধনঞ্জয় ইত্যাদি চরিত্র বাউলের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ নিজের বাউলসত্তা ঠাকুরদার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁকে রবি বাউল বলা হয়। তবে তাঁর বাউলসত্তা একটু ভিন্ন। দেহতত্ত্বকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন তিনি। তাঁর সাধনা একান্ত তাঁর নিজস্ব

দর্শন, যার বেশিরভাগ বাউলদর্শনের সাথে মিলে যায়। বাউল দর্শনের সাথে রবীন্দ্রনাথের বাউল সাধনার মূল পার্থক্য দেহতত্ত্ব বিষয়ে। তিনি দেহতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। দেহতত্ত্ব বিষয়টি সাধারণ সমাজ-সংসারের কাছে বিবেকেরও প্রশ্ন। সমাজে বাস করে বাউলের দেহতত্ত্বকে গ্রহণ করলে সমাজে থাকা সম্ভব নয়, সমাজের বাইরে গিয়ে সাধনা করতে হবে। তাই গৃহীর জন্য এই দর্শন অকার্যকর। কিন্তু রবি বাউলের দর্শন সংসারের যে কোনো মানুষ গ্রহণ করতে পারবে। এবং এই দর্শনে জীবন যাপন করতে পারবে। তাই বলা যায় বাউল দর্শনকে সংস্কার করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন এক বাউল দর্শনের চিত্র এঁকেছেন। তাই এটি হয়ে উঠেছে রবি বাউলের দর্শন।

তথ্যনির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাউল, *শিশু ভোলানাথ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৭১
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১১, পৃ. ২৩৩
৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য*, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ৫৬
৪. সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার বাউল: কাব্য ও দর্শন*, কলকাতা: জে. এন. বস এ্যান্ড কোং, ১৯৫৪, পৃ. ৬৫
৫. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, ঢাকা: অবসর, ২০০৬, পৃ. ৩২৪
৬. গোলাম মুরশিদ, গোলাম মুরশিদের ধারাবাহিক রচনা: বাউল গান, বিডিনিউজ২৪.কম, ৩১ জুলাই ২০২০
৭. আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল: সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, কথাপ্রকাশ সংস্করণ: ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ৮৯
৮. বেলাল হোসেন (সম্পা.), *ফোকলোরিক রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৪৩-এ সংকলিত আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৭৭
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩২২
১১. স্বরোচিষ সরকার, সাক্ষাৎকার, তারিখ: ১৮.১১.২০২২
১২. স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা, ২০০৫, পৃ. ৭০
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩২৯
১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫০
১৫. আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল: সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত*, ঢাকা: কথা প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ: ২০০২, কথাপ্রকাশ সংস্করণ: ২০১৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২০১৭, পৃ. ১০০
১৬. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৭৮
১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮
১৮. বেলাল হোসেন (সম্পা.), *ফোকলোরিক রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৪০-এ সংকলিত আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ।
১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২৭৮
২১. *প্রাগুক্ত*।
২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২।

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০
২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮
২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩
২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২
২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭
২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭
৩০. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৬৫
৩১. *প্রাগুক্ত*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২৫৮
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৮
৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪
৩৪. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৫১
৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫১
৩৬. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৭৯
৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৬।
৩৮. *প্রাগুক্ত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩১৩
৩৯. স্বরোচিষ সরকার, *তদেব*, পৃ. ৬৯
৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ৩৩০
৪১. *প্রাগুক্ত*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ. ২৩৯
৪২. গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*।
৪৩. আনোয়ারুল করীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯
৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫
৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

বেলাল হোসেন (সম্পা.), *ফোকলোরিক রবীন্দ্রনাথ*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ১৩৮-এ সংকলিত আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধ।